# 17

# স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা ও পঞ্চায়েতিরাজ
# Local Self Government and Panchayati Raj

বৈদিক যুগের পর ভারতের গ্রামকে একটি সংগঠিত রাজনৈতিক সংস্থারূপে স্বীকার করা হত। চার্লস মেটকাফ লিখেছিলেন যে গ্রামীণ সমাজগুলি যেন এক একটি ছোটখাট স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রজাতন্ত্র (Republic)। এক রাজবংশের পতনের পর আর এক রাজবংশের উদ্ভব হয়েছে, এক বিপ্লবের পর অন্য এক বিপ্লব সংঘঠিত হয়েছে কিন্তু স্বয়ংশাসিত গ্রামীণ সমাজের কোন পরিবর্তন হয়নি। যেখানে কোন কিছুই দীর্ঘস্থায়ী নয়, সেখানে এরাই টিকে আছে।

ব্রিটিশ শাসকেরা ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার নীতি অনুসরণ করায় সনাতন গ্রামগুলির স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে।

গান্ধীজী বলতেন ভারতের স্বাধীনতার সূত্রপাত হবে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে।

স্বাধীন ভারতের নতুন সংবিধানের খসড়া তৈরী হলে তাতে পঞ্চায়েত সম্পর্কে কোন উল্লেখ না দেখে অনেকেই অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আম্বেদকর তাদের প্রতিবাদের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন, গ্রাম পঞ্চায়েতই ভারতের সর্বনাশের মূল। গ্রামগুলি আঞ্চলিকতার আবর্জনাস্তুপ এবং অজ্ঞতা, সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার অন্ধকূপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাঁর এই কথার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে অবশেষে সংবিধানের 40 ধারায় নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে ঘোষণা করা হয় যে রাজ্য সরকারগুলি গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করবেন। বলবন্ত মেহেতা কমিটির সুপারিশ অনুসারে স্বাধীন ভারতের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

গণতান্ত্রিক স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে গণতন্ত্র তৃণমূলে সঞ্চারিত হয়। গণতন্ত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য হল ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ আর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছায়।

**গুরুত্ব (Importance)**

1. বৃহদায়তন রাষ্ট্রে আঞ্চলিক সমস্যার সঠিক এবং দ্রুত সমাধান স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে সম্ভব হয়। বৃহৎ রাষ্ট্রে সরকারের পক্ষে স্থানীয় সমস্যার সমাধান করা খুবই কঠিন। স্থানীয় সমস্যার অজ্ঞতার দরুন জাতীয় সরকারের পক্ষে স্থানীয় শাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। স্থানীয় সমস্যার স্থানীয় সমাধান প্রয়োজন।

2. স্থানীয় শাসনকে গণতন্ত্রের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র বলা হয়। স্থানীয় শাসনে অংশ গ্রহণ করায় সাধারণ নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায় ও অভিজ্ঞতা লাভ হয় যাহা পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় বৃহত্তর দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে নাগরিকদের উপযুক্ত করে তোলে। স্থানীয় শাসনব্যবস্থা নাগরিককে আত্মনির্ভরশীল ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলে।

3. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে অর্থ সংগ্রহ করে স্থানীয় সমস্যাগুলির সমাধান করা হয় বলে দেশের সরকারের উপর আর্থিক ব্যয়ের চাপ কম হয়।

4. বলবন্ত রাও কমিটি পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠা করে তিনটি উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছে ঃ (ক) স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, (খ) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত করে উহা গ্রামীণ সমাজের হাতে অর্পণ করা এবং (গ) উন্নয়ন কার্যে জনসাধারণের ইচ্ছা ও কর্মশক্তির প্রয়োগ।

ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দু'ধরনের—গ্রামীণ ও পৌর। গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের কেন্দ্রে আছে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা।

**পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থা (Panchayati Raj System) ঃ** পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের সঙ্গে পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রামের উন্নয়ন কাজের ভার প্রথমত গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর, দ্বিতীয়ত ব্লকস্তরে পঞ্চায়েত সমিতির উপর এবং তৃতীয়ত জিলা পরিষদের উপর ন্যস্ত হয়েছে অর্থাৎ ত্রিস্তর বিশিষ্ট (Three-tier structure) সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে।

1992 সালে 73তম সংবিধান সংশোধনী আইনের সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কয়েকটি পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে।

(ক) তপসিলী জাতি ও উপজাতির জন্যে জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে।

(খ) মোট আসনের 1/3 অংশ মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত হয়েছে।

(গ) পঞ্চায়েতের হাতে অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

(ঘ) পঞ্চায়েতকে সম্পদ সংগ্রহের জন্যে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

(ঙ) প্রত্যেক স্তরে পঞ্চায়েত সংস্থার আর্থিক অবস্থা বিচার করার জন্যে রাজ্য সরকার অর্থ কমিশন গঠন করবেন।

(চ) প্রতি পাঁচ বছর পর পঞ্চায়েত নির্মাণ করা হবে।

**গ্রাম পঞ্চায়েত (Village Panchayat)**

গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের সর্বনিম্ন পর্যায়ে আছে গ্রাম পঞ্চায়েত। একটি মৌজা বা কয়েকটি মৌজা নিয়ে একটি গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করা হয়।

গ্রাম পঞ্চায়েত 5 থেকে 25 জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। কোন গ্রাম পঞ্চায়েতে কতজন সদস্য থাকবে তা রাজ্য সরকার কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক স্থির করে দেবেন।

প্রতি 500 জন পিছু একজন করে সদস্য নির্বাচিত হবে। সদস্যগণ সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবে। অনূন্য 18 বছর বয়স্ক যে কোন ব্যক্তিই নির্বাচনে ভোট দিতে এবং নির্বাচিত হতে পারেন। প্রত্যেক গ্রামসভাকে প্রতি 6 মাসে একবার করে একটি সভা আহ্বান করতে হয়।

**সদস্যদের যোগ্যতা ঃ** যে সব ব্যক্তি পঞ্চায়েত সমিতি, জিলা পরিষদ বা পৌরসভার সদস্য তারা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হতে পারবে না। এছাড়া যারা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের বেতনভোগী কর্মচারী বা পঞ্চায়েতি সংস্থার কর্মচারী তারাও গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হতে পারে না। যারা 6 মাসের অধিক কারাদণ্ড ভোগ করেছে বা বিকৃতমস্তিষ্ক বলে ঘোষিত হয়েছে বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার শুল্ক প্রদান করেনি, সে ব্যক্তি সদস্য হতে পারবে না। সদস্যদের কার্যকাল 5 বছর।

**কার্যাবলী ঃ** গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথম সভায় সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে প্রধান ও একজনকে উপপ্রধান নির্বাচন করেন। পঞ্চায়েত প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মকর্তা। পঞ্চায়েতের অধিবেশন মাসে অন্ততঃ একবার অনুষ্ঠিত হয়। মোট সদস্যদের 1/3 অংশ উপস্থিত না থাকলে অধিবেশন বৈধ বলে গণ্য হবে না।

গ্রাম পঞ্চায়েত তিন ধরনের কাজ করে—বাধ্যতামূলক কাজ, অর্পিত কাজ এবং ইচ্ছাধীন কাজ।

**1. বাধ্যতামূলক কাজ**

(ক) জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, জলনিষ্কাশন ও ময়লা নিষ্কাশন ;

(খ) বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, ও জলাধার পরিষ্কার রাখা ;

(গ) ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত বা অন্য কোন সংক্রামক ব্যাধির নিবারণ ;

(ঘ) রাস্তা তৈরী, সংরক্ষণ ও মেরামত করা ;

(ঙ) সর্বসাধারণের ব্যবহার্য পুকুর, গোচারণ ভূমি, শ্মশান ও কবরস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ ;

(চ) জিলা ম্যাজিস্ট্রেট বা জিলাপরিষদ পঞ্চায়েত এলাকা সম্পর্কে কোন সংবাদ জানতে চাইলে উহা প্রদান করা ;

(ছ) গ্রাম পঞ্চায়েত তহবিল নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন ;

(জ) নিজ এলাকায় চৌকিদার ও দফাদার নিয়ন্ত্রণ ;

(ঝ) ন্যায় পঞ্চায়েত গঠন ;

(ঞ) পঞ্চায়েত আইন অনুসারে কর আদায়।

**2. অতিরিক্ত কাজ**

রাজ্য সরকার গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর অতিরিক্ত কর্তব্যভার অর্পণ করতে পারে যেমন—

(ক) গ্রামে প্রাথমিক, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ;

(খ) চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন ;

(গ) খেয়াঘাট পরিচালনা ;

(ঘ) জলসেচ ব্যবস্থা ;

(ঙ) পতিত জমিতে চাষব্যবস্থা প্রবর্তন ;

(চ) খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ;

(ছ) বাস্তুহারাদের পুর্নবাসন ;

(জ) পশুচিকিৎসার ব্যবস্থা ;

(ঝ) বৃক্ষরোপণ ;

(ঞ) ভূমিসংস্কার আইন কার্যকরী করতে সাহায্য দান।

**3. ইচ্ছাধীন কাজ**

(ক) পাঠাগার স্থাপন ;

(খ) রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করা ;

(গ) বাজার স্থাপন ;

(ঘ) কূপ বা দীঘি খনন ;

(ঙ) সমবায় কৃষি ও বিপণির প্রবর্তন ;

(চ) সরকারী ঋণ পেতে কৃষকদের সাহায্য করা ;

(ছ) কুটীর শিল্পের উন্নয়ন ;

(জ) গ্রামে চুরি ডাকাতি নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করা,

(ঝ) অগ্নিকাণ্ড নিবারণ ;

(ঞ) বেওয়ারিস পশুর তত্ত্বাবধান।

**পঞ্চায়েতের ক্ষমতা ঃ** পঞ্চায়েতের অনুমতি ব্যতীত পঞ্চায়েত এলাকায় কোন ব্যক্তি কোন বাড়ি ঘর তৈরী করতে পারবে না। অঞ্চলের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য পঞ্চায়েত বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে এবং জনস্বাস্থ্য ভঙ্গকারী ব্যক্তির উপর নোটিশ জারি করে জনস্বাস্থ্যের পরিপন্থী কাজ থেকে বিরত থাকতে আদেশ দিতে পারে। পানীয় জলের জন্য কোন জলাশয় আলাদা করে রেখে কেবল ওই কাজেই তাহা ব্যবহারের নির্দেশ দিতে পারে। জমি ও বাস গৃহের উপর কর, যানবাহনের লাইসেন্স ফী, বাজার থেকে আয় ও সরকার বা জিলা পরিষদ থেকে প্রাপ্ত সাহায্য হল পঞ্চায়েতের আয়ের উৎস

কোন গ্রাম পঞ্চায়েত সেই অঞ্চলে ছোটোখাট দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচারের জন্যে ন্যায় পঞ্চায়েত গঠন করতে পারে। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের দ্বার নির্বাচিত 5 জন সদস্য নিয়ে ন্যায় পঞ্চায়েত গঠিত হয়।

**পঞ্চায়েত সমিতি (Panchayat Samity)**

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে পঞ্চায়েত সমিতি। প্রতিটি জেলা কয়েকটি ব্লকে বিভক্ত। প্রতিটি ব্লকের জন্যে একটি করে পঞ্চায়েত সমিতি আছে।

পঞ্চায়েত সমিতি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয় ঃ

(ক) ব্লক এলাকায় অবস্থিত প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানগণ পদাধিকার বলে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হন।

(খ) ব্লক এলাকা থেকে নির্বাচিত লোকসভা ও বিধান সভার সদস্যগণ, তবে কোন মন্ত্রী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হতে পারেন না।

(গ) ব্লক এলাকার গ্রামগুলি থেকে প্রতি 2500 জন ভোটদাতা পিছু একজন সদস্য নির্বাচিত হন।

পঞ্চায়েত সমিতির কার্যকাল 5 বছর। সমিতির সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে থেকে একজন সভাপতি ও একজন সহসভাপতি নির্বাচিত করেন। সভাপতি 1000 টাকা ও সহসভাপতি 900 টাকা বেতন পান। সংশ্লিষ্ট ব্লক উন্নয়ন অফিসার সমিতির কার্যনির্বাহক।

**পঞ্চায়েত সমিতির কার্যাবলী ঃ** মাসে অন্ততপক্ষে একবার পঞ্চায়েত সমিতির সভা বসবে। সভায় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সভাপতিত্ব করবেন, তার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি ওই কাজ করবেন।

পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান দায়িত্ব হল ব্লক এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। দ্বিতীয়ত, সমিতি কৃষি, কুটির শিল্প, সমবায়, গ্রামীণ ঋণদান ব্যবস্থা, জলসরবরাহ, হাসপাতাল, শিক্ষাকেন্দ্র প্রভৃতির উন্নয়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে। তৃতীয়ত রাজ্য সরকার কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত হয়ে কোন পরিকল্পনা বা কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা, নতুন পঞ্চায়েত আইনে পঞ্চায়েত সমিতির উপর কিছু অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে যথা সমবায় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সংস্থার পরিচালক সমিতিতে সদস্য প্রেরণ, সুসংহত নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণ ইত্যাদি।

**পঞ্চায়েত সমিতির আয় ঃ** পঞ্চায়েত সমিতির একটি তহবিল থাকবে আর সেখানে সমস্ত আয় জমা হবে। ফেরিঘাট, হাটবাজার, যানবাহনের লাইসেন্স ফী, টোল ও স্থানীয় কর থেকে পঞ্চায়েত সমিতি অর্থ সংগ্রহ করে। রাজ্য সরকার ও জিলা পরিষদ পঞ্চায়েত সমিতিকে অর্থ সাহায্য করে এছাড়া পঞ্চায়েত সমিতি নিজ সম্পত্তির জামিনে ঋণ গ্রহণ করতে পারে এবং সরকারের কাছ থেকে ঋণ নিতে পারে।

**জিলা পরিষদ (Zilla Parishad)**

ইংলণ্ডের কাউন্টি কাউন্সিলের অনুকরণে 1882 সালের পর ভারতবর্ষে প্রত্যেকটি জেলায় একটি করে জেলাবোর্ড স্থাপিত হয়। ইংলণ্ডে কাউন্টি কাউন্সিলের উপর পুলিশের ভার আছে, জেলাবোর্ডের উপর তাহা ছিল না। 1918 সালের পূর্বে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জেলাবোর্ডের সভাপতিত্ব করতেন। 1919 সালে শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হবার পর জেলাবোর্ড তার সভাপতি নির্বাচনের ভার পেল।

1963 সালে পশ্চিমবঙ্গ আইনসভায় জিলা পরিষদ গঠনের জন্য আইন পাস করা হয়।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পর্যায়ে আছে জিলা পরিষদ। জিলা পরিষদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয় ঃ

(ক) জিলার অন্তর্গত সকল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিগণ ;

(খ) জিলা থেকে নির্বাচিত বিধানসভা ও লোকসভার সদস্যগণ ;

(গ) জিলায় বসবাসকারী রাজ্যসভার সদস্যগণ ;

(ঘ) প্রতি ব্লক থেকে 2 জন করে সদস্য নির্বাচন করা হয় ;

(ঙ) জিলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি জিলা পরিষদের সদস্য হন ;

(চ) জিলা পরিষদের 1/3 সদস্যপদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত।

জিলা পরিষদের প্রথম অধিবেশনে সদস্যগণ তাহাদের মধ্যে থেকে একজন সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচন করেন। লোকসভা, বিধানসভা বা রাজ্যসভার কোন সদস্য সভাপতি বা সহসভাপতি নির্বাচিত হতে পারেন না। পশ্চিমবঙ্গে জিলাশাসক হলেন জিলা পরিষদের কার্যনির্বাহী আধিকারিক। জিলা পরিষদের একজন কর্মসচিব থাকেন। জিলা পরিষদের কার্যসম্পাদনের জন্য 10টি স্থায়ী কমিটি আছে।

**কার্যাবলী ঃ** জিলা পরিষদ নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পন্ন করে থাকে ঃ

1. জিলার অন্তর্গত বিভিন্ন ব্লকের উন্নয়ন কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন,

2. কৃষি, শিল্প, সমবায় আন্দোলন, গ্রামীণ ঋণ, জল সরবরাহ, জনস্বাস্থ্য, হাসপাতাল, প্রাথমিক ও বয়স্কশিক্ষা, সমাজকল্যাণ ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য পরিকল্পনা গঠন ও আর্থিক সাহায্য দান।

3. জিলার উন্নয়নের জন্য সরকারকে পরামর্শ দান।

4. গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিকে অনুদান প্রদান।

5. পঞ্চায়েত সমিতিগুলির বাজেট পরীক্ষা ও অনুমোদন।

6. রাজ্য সরকার কোন অতিরিক্ত কাজের দায়িত্বভার জিলা পরিষদের উপর অর্পণ করতে পারে।

জিলা পরিষদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্যে স্থায়ী কমিটি আছে ঃ অর্থ, জনস্বাস্থ্য, পূর্তকার্য, কৃষি, সেচ ও সমবায়, শিক্ষা, ক্ষুদ্রশিল্প, ত্রাণ ও জনকল্যাণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ভূমিসংস্কার, মৎস্যচাষ ও পশুপালন।

**আয় ঃ** জিলা পরিষদের একটি তহবিল থাকবে। পরিষদের সমস্ত আয় সেখানে জমা হবে। জিলা পরিষদ তার আয়ের জন্য প্রধানত রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান ও ঋণের উপর নির্ভর করে। জিলা পরিষদের আর্থিক অবস্থা বিচারের জন্যে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার একটি অর্থ কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে।

গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার উপর রাজ্য সরকারের ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রয়েছে। সরকারের ক্ষমতা এতই ব্যাপক যে অনেকে মনে করে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা মিথ্যায়

পর্যবসিত হয়েছে। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সরকার স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ঃ

1. গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মসচিব, পঞ্চায়েত সমিতির কার্যনির্বাহী আধিকারিক এবং জিলা পরিষদের কার্যাধ্যক্ষ সরকারী কর্মচারী। এদের মাধ্যমে সরকার পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

2. রাজ্য সরকার পঞ্চায়েতের কাজকর্ম তদারক করতে পারে ;

3. সরকার ইচ্ছা করলে অনুদান হ্রাস অথবা বন্ধ করে দিতে পারে ;

4. সরকার স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলির যে কোন প্রস্তাব বাতিল করে দিতে পারে ;

5. সরকার ইচ্ছা করলে যে কোন সরকারী কর্মচারীর দ্বারা স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থাগুলির কর্তব্য সম্পর্কে অনুসন্ধানের আদেশ দিতে পারে।

6. রাজ্যসরকার প্রধান ও উপপ্রধান, সভাপতি ও সহ-সভাপতি, সভাধিপতি ও সহ-সভাধিপতিকে কাজে অবহেলার দায়ে পদচ্যুত করতে পারে।

7. সরকার যে কোন সময় যে কোন আদেশ দিতে পারে এবং স্বায়ত্তশাসন সংস্থাসমূহ সেই আদেশ পালন করতে বাধ্য থাকবে।

8. রাজ্য সরকার জিলা পরিষদের বাজেট অনুমোদন করে। রাজ্য সরকার বিভিন্ন স্তরের পঞ্চায়েতের হিসাব পরীক্ষার জন্য হিসাবরক্ষক নিযুক্ত করে।

**স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার মূল্যায়ন ঃ** স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার আত্মনির্ভরতার আদর্শ সক্রিয় ছিল ব্রিটিশ যুগে তাহা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। গ্রামের মানুষ সব ব্যাপারেই সরকারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিকেন্দ্রীকরণের আদর্শকে সম্মুখে রেখে স্বনির্ভরশীল হয়ে ওঠা সহজ নয়। অতিমাত্রায় সরকারী হস্তক্ষেপ ও ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন যাহা ইংরেজ আমলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে অভিশাপরূপে দেখা দিয়েছিল আজও তার সম্পূর্ণ অবসান ঘটেনি। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি স্বায়ত্তশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের উপর রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণের মাত্রা কম নয়। অবশ্য দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার রোধের জন্য পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার উপর রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে। গ্রামের অশিক্ষিত মানুষদের স্বায়ত্তশাসন পরিচালনের কোন অভিজ্ঞতা নেই। ধীরে ধীরে তাদের এ বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে নতুবা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে।

ভারতের গ্রামীণ শাসনব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিভেদ একটা বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর দরুন ভোটাররা অনেক সময় অপর জাতি বা সম্প্রদায়ের যোগ্য ব্যক্তিকে সমর্থন না করে নিজজাতির অযোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেয়। রাজনৈতিক দলগুলি এই জাতিভেদকে নিজ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করে। রাজনৈতিক চেতনা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার উগ্রতা কমে যাবে এবং রাজনৈতিক দাবির ভিত্তিতে ভোট দিতে শিখবে।

এছাড়া দুর্নীতি, নিরক্ষরতা এবং প্রশাসনিক দক্ষতার মান যে যথেষ্ট উন্নত নয় তাহা অস্বীকার করে লাভ নাই।

পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা গ্রামীণ শাসনব্যবস্থাকে গণতন্ত্রীকরণ করেছে এবং বিকেন্দ্রীকরণের আদর্শকে সম্মুখে রেখে অগ্রসর হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গণমুখী স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থাকে nursery of democracy বলা হয়। আমাদের দেশের 80% লোক গ্রামে বাস করে বলে গ্রামীণ গণতন্ত্রের আদর্শ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুষ্ঠু ও প্রকৃত গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন দেশে প্রতিষ্ঠিত না হলে গণতন্ত্র সাফল্য লাভ করতে পারবে না।

**পৌরসভা (Municipality)**

কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি মহানগরীর পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলিকে কর্পোরেশন বলা হয় আর অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট শহরগুলির স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি পৌরসভা বা মিউনিসিপ্যালিটি বলা হয়। সাধারণত প্রত্যেক শহরের জন্যে একটি করে পৌরসভা গঠিত হয়। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে পৌরসভাগুলি দুই বা ততোধিক শহর নিয়ে গঠিত হতে পারে। যেমন হুগলী-চুচুঁড়া পৌরসভা, বালি পৌরসভা, শ্রীরামপুর পৌরসভা ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গের পৌরসভাগুলি 1932 সালের বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে পরিচালিত হয়। 1992 সালের 74তম সংশোধনের মাধ্যমে পৌরসভা বিষয়ে কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করা হয়েছে।

উল্লিখিত সংশোধন অনুসারে রাজ্য আইনসভা আইন করে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে পৌরসভার সদস্য নিযুক্ত করতে পারে,

1. স্থানীয় শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ;
2. পৌরসভা এলাকায় বসবাসকারী লোকসভা, রাজ্যসভা ও রাজ্য বিধানসভার সদস্যগণ;
3. বিভিন্ন ওয়ার্ড কমিটির সভাপতিগণ (3 লক্ষ ব্যক্তি নিয়ে একটি করে ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হয়) ;
4. পৌরসভার 1/3 অংশ আসন মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

**গঠন ঃ** পৌরসভার সদস্যসংখ্যা 9 থেকে 30-এর মধ্যে থাকে। পৌরসভার সদস্যদের কমিশনার বলা হয়। পৌরসভার কাজ পরিচালনার ভার থাকে কমিশনারদিগের উপর। কমিশনারগণ পৌরসভার জনসাধারণের দ্বারা প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। পৌরসভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে থেকে একজন সভাপতি (Chair-man) ও একজনকে সহ-সভাপতি (Vice-chairman) নির্বাচিত করেন। পৌর কমিশনারগণের কার্যকাল চার বছর। অবশ্য প্রয়োজন মনে করলে রাজ্য সরকার পৌরসভার কার্যকাল আরও এক বছর বাড়িয়ে দিতে পারে। সভাপতি পৌরসভার সভাগুলিতে সভাপতিত্ব করেন। তিনি অনুপস্থিত থাকলে সহ-সভাপতি সভাপতিত্ব করেন।

যেসব পৌরসভার আয় এক লক্ষ টাকার বেশি সেখানে সরকারী অনুমোদনক্রমে একজন মুখ্য কার্যনির্বাহক (Chief Executive Officer) নিয়োগ করা যেতে পারে। পৌরসভার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে আছে একজন স্বাস্থ্য আধিকারিক একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং একজন স্বাস্থ্য পরিদর্শক (Sanitary Inspector)। রাজ্য সরকার জেলাশাসক, বিভাগীয় কমিশনার এবং মহকুমাশাসকের মাধ্যমে পৌরসভাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

**কার্যাবলী ঃ** নগরজীবনকে সুন্দর ও মঙ্গলময় করে তোলার জন্য পৌরসভাগুলিকে নানাবিধ কাজ করতে হয়। রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণ, রাস্তায় আলো দেওয়া এবং জল সিঞ্চিত করা, ময়লা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা, সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা পৌরসভাগুলির কাজ। এছাড়া পৌরসভা বাজার ও কসাইখানা স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণ করে। ঔষধ বিক্রয় এবং ভেজাল খাবার নিয়ন্ত্রণ, শ্মশান ঘাট ও কবরস্থান নির্মাণ ও সংরক্ষণ, খোঁয়াড় নির্মাণ, জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখা, গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণ, প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ও পরিচালনা করে থাকে। পৌরসভা দাতব্য ঔষধালয় এবং পাঠাগার গুলিকেও অর্থ সাহায্য করে।

**আয় ঃ** পৌরসভাগুলির আয়ের প্রধান উৎস হল শহরের জমি ও বাড়ির উপর ধার্য কর। একে হোল্ডিং কর (holding tax) বলে ; এছাড়া জল, আলো, এবং ময়লা নিষ্কাশনের জন্য বাড়ির উপর কর ধার্য করা হয়। পৌরসভাগুলি বিভিন্ন পেশা, বৃত্তি, ব্যবসায়, গুরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি এবং রিক্সার উপর কর ধার্য করে। খেয়াঘাট ও পুলের উপর চলাচলকারী যানবাহনের উপরে ধার্য শুল্ক এবং পৌরসভার নিজস্ব সম্পত্তি থেকেও কিছু আয় হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পৌরসভা তার এলাকায় আনীত দ্রব্যের উপর চুঙ্গী (octroi) আদায় করে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে চুঙ্গী কর রদ করা হয়েছে। পৌরসভাগুলি রাজ্য সরকারের অনুমতিক্রমে ঋণ গ্রহণ করতে পারে।

**সমস্যা ঃ** পৌরসভাগুলি নানাধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে ঃ

1. পৌরসভাগুলির পরিচালন ব্যয় অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে বলে উন্নয়নমূলক কোন কাজই তারা করতে পারে না। কর্মচারীদের বেতন দিতেই সব আয় খরচ হয়ে যায়।

2. পৌরসভাগুলি নানা দুর্নীতির একটা কেন্দ্রস্থল বলে অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ পৌরসভা দলগত স্বার্থসিদ্ধির আখড়ায় পরিণত হয়েছে।

3. পৌরসভাগুলিতে দক্ষতার অভাব বিশেষ দেখা যায়। দক্ষ এবং নিরপেক্ষ পৌরস্বায়ত্তশাসনই আমাদের লক্ষ্য।

## কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (Calcutta Municipal Corporation)

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট প্রণীত এক সনদের দ্বারা কলকাতা মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীগণ পৌরসভা গঠন করে। কলকাতা কর্পোরেশনকে যথার্থ গণতান্ত্রিক সংগঠনে পরিণত করার কৃতিত্ব হল স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর। সুরেন্দ্রনাথ 1923 সালে স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে

কলকাতা, হাওড়া, চন্দননগর, আসানসোল ও শিলিগুড়িতে কর্পোরেশন স্থাপন করা হয়েছে। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন 1951 সালের কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন দ্বারা সংগঠিত। 1983 সালে ওই আইনটির সংশোধন করা হয়েছে।

**গঠন ঃ** নতুন আইন অনুসারে কলকাতা কর্পোরেশনের মোট সদস্য সংখ্যা হল 150। এদের মধ্যে 141 জন কাউন্সিলর। কাউন্সিলরগণ 7 জন অল্ডার ম্যান নির্বাচিত করেন। কলকাতা নগরোন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (Calcutta Improvement Trust) এবং সি. এম. ডি. এ. -এর প্রশাসক পদাধিকার বলে কর্পোরেশনের সদস্য হন। কাউন্সিলরদের কার্যকাল 5 বছর। কাউন্সিলরগণ নিজেদের মধ্যে থেকে একজন মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত করেন। কলকাতা কর্পোরেশনের প্রধান প্রশাসনিক সংস্থা হল স-পরিষদ মেয়র। মেয়র, ডেপুটি মেয়র ও অনধিক 10 জন কাউন্সিলরকে নিয়ে স-পরিষদ মেয়র গঠিত হয়। স-পরিষদ মেয়র কর্পোরেশনের নামে সকল কার্যনির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

কর্পোরেশন পৌরকার্য পরিচালনার জন্যে দু'ধরনের কমিটি গঠন করে—স্থায়ী কমিটি (Standing committee) এবং এলাকা কমিটি (Borough committee)। জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর, নগরোন্নতি, পরিকল্পনা হিসাব প্রভৃতি বিষয়ের প্রত্যেকটির জন্যে একটি করে স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। বিভিন্ন এলাকায় ভালোভাবে পৌরকার্য নির্বাহের জন্যে বোরো কমিটি বা এলাকা কমিটি গঠিত হয়। কতকগুলি ওয়ার্ড নিয়ে একটি বরো গঠিত হয়।

কর্পোরেশনের প্রধান কার্যনির্বাহক হলেন কমিশনার। কমিশনারকে কর্পোরেশনের প্রধান কার্যনির্বাহক অফিসার বলা হত। কমিশনার রাজ্য রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদের (State Public Service Commission) সুপারিশ অনুসারে রাজ্য সরকার কর্তৃক পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হন। কমিশনারকে সাহায্য করার জন্যে একজন ডেপুটি কমিশনার আছেন। কমিশনার ও ডেপুটি মেয়র ছাড়াও কর্পোরেশনের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী আছে, চীফ ইঞ্জিনিয়ার, হেল্‌থ অফিসার প্রভৃতি। বর্তমানে কর্পোরেশনের নির্বাচন সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

পৌরজীবনের সকল দিকেই কর্পোরেশনের কার্যাবলী বিস্তৃত। কর্পোরেশনের প্রধান প্রধান কাজগুলি এইরূপ—শহরে শোধিত ও অশোধিত জল সরবরাহের দায়িত্ব কর্পোরেশনের। শহরের রাস্তায় আলো দেওয়া, জল সিঞ্চিত করা, ময়লা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা, সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা, জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখা কর্পোরেশনের প্রধান কাজ, এছাড়া কর্পোরেশন বাজার ও কসাইখানা স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণ করে, ভেজালমিশ্রিত অথবা খোলা খাবার এবং ঔষধ বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ, শ্মশানঘাট ও কবরস্থান নির্মাণ ও সংরক্ষণ, গৃহনির্মাণ নিয়ন্ত্রণ, প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ও পরিচালনা করে থাকে। কর্পোরেশন হাসপাতাল, দাতব্য ঔষধালয় এবং পাঠাগারগুলিকে অর্থ সাহায্য করে।

**আয় ঃ** কর্পোরেশনের আয়ের প্রধান উৎস হল শহরের জমি ও বাড়ির উপর ধার্য কর। কর্পোরেশনের আয়ের 60 শতাংশ এই থেকে পাওয়া যায়। কর্পোরেশনের আয়ের দ্বিতীয় উৎস হল বিভিন্ন পেশা, বৃত্তি, ব্যবসা, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, রিক্সা, পশু প্রভৃতির উপর ধার্য কর। মোটর গাড়ির উপর কর ধার্য করে রাজ্য সরকার, কিন্তু কর্পোরেশন তার একাংশ লাভ করে থাকে। এছাড়া বিজ্ঞাপনের জন্য লাইসেন্স ফী এবং বাজার থেকেও কর্পোরেশনের আয় হয়। কর্পোরেশন রাজ্য সরকারের অনুমতি নিয়ে ডিবেঞ্চারের মাধ্যমে ঋণ সংগ্রহ করতে পারে। রাজ্য সরকারের কাছ থেকেও কর্পোরেশন ঋণ পেতে পারে।

কর্পোরেশনের বিপুল দায়িত্বের তুলনায় তার আয় খুবই সীমিত। কর্পোরেশন যা আয় করে তা তার কার্য সম্পাদন করতেই ব্যয় হয়ে যায়। কর্পোরেশনের আয়ের তুলনায় তার দায়িত্ব অনেক বেশী বলে নগর জীবনের সব সমস্যার সমাধান করা তার পক্ষে দুরূহ।

**সমস্যা ঃ** কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, তা হল ঃ

(1) কর্পোরেশনের আর্থিক সঙ্কটের সুযোগ নিয়ে রাজ্য সরকার তার উপর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করেছে।

(2) কলকাতা কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে নানাবিধ দুর্নীতির অভিযোগ দেখা যায়।

(3) কর্পোরেশনে পরিচালন ব্যয় অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্পোরেশনের আয়ের অধিক অংশটাই কর্মচারীদের বেতন দিতে ব্যয় হয়ে যায়, ফলে কর্পোরেশন উন্নয়নমূলক কাজকর্ম বিশেষ করতে পারে না।

(4) কর্পোরেশন রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির একটা আখড়ায় পরিণত হয়ে পড়েছে।

## অনুশীলনী

1. পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থার মূল্যায়ন কর।
2. পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েতের গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।
3. পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত সমিতি ও জিলা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।
4. পশ্চিমবঙ্গের পৌরসভার গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।
5. কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।